দামেরখণ্ড গণহত্যা

সত্যজিৎ রায় মজুমদার

১৯৭১
গণহত্যা ও নির্যাতন
আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট

বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা : ১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
মুনতাসীর মামুন

সহযোগী সম্পাদক
মামুন সিদ্দিকী

প্রকাশকাল
পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১

দামেরখণ্ড গণহত্যা
[Damerkhando Genocide]

©
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
[1971 : Genocide-Torture Archive & Museum Trust]
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী
[Bangladesh Historty Congress]

প্রকাশক
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
৩৩৪ শের-এ-বাংলা রোড, ময়লাপোতা মোড়, খুলনা ৯১০০
itihassammilani.bd@gmail.com, archivemuseum1971@gmail.com
০১৮১৬২৮৮৬৭৪, ০১৭১৫৪৫৭৩৮২, ০১৭১১২১৭১১১

মুদ্রণ
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ, ৬০/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

পরিবেশক
সুবর্ণ
জার্নিম্যান বুকস্

গ্রন্থ নকশা ও প্রচ্ছদ
তারিক সুজাত

মূল্য : ১২৫ টাকা

ISBN : 978 984 33 8461 4

ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড প্রদত্ত অধ্যাপক কবীর চৌধুরী অনুদানের সহায়তায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে

গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা-নির্যাতন। একের অধিক মানুষকে হত্যাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে গণহত্যা হিসেবে। নির্যাতনের অন্তর্গত শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও দেশত্যাগে বাধ্য করা। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বগাথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং তা স্বাভাবিক। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন একটি দেশে এত অল্প সময়ে এতো হত্যাও হয়নি। যদিও আমরা বলি ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছেন কিন্তু মনে হয় সংখ্যাটি তারও বেশি হবে। গণহত্যা, বধ্যভূমি, নির্যাতন মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু গুরুত্ব ততোটা এর ওপর দেয়া হয়নি। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের ব্যাপারটি আড়ালে পড়ে যায়। কিন্তু ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে গণহত্যা হয়েছিল তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রে এখনও সেই গণহত্যার কথা ফিরে আসে। যে কারণে ইউরোপে ফ্যাসীবাদ আর নাজিবাদ জায়গা করে নিতে পারেনি। আমাদের এখানে তা হয়নি দেখে গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে এখনও অনেকে প্রশ্ন করার সাহস রাখেন এবং হত্যাকারীদের সমাজ ও রাজনীতিতে এমনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তারা একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশে সামরিকবাদ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ আবারও শেকড় গেড়েছে।

এ দেশে গণহত্যা-নির্যাতন চালিয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, শান্তি কমিটির সদস্যরা। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ থেকেই মূলত এসব বাহিনীতে গেছে কর্মিরা। সুখের বিষয়, এসব মানবতা-বিরোধীদের বিচার শুরু হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে।

দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। নির্যাতনের শিকার বহু নারী-পুরুষ এখনও রোমহর্ষক স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের কথা, এমনকী নির্যাতনের কথা বিজয়ের গৌরব-ভাষ্যে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায়, অনুপুঙ্খ ইতিহাস অনুসন্ধানে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। গণহত্যা, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা তৈরি আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসার পাশাপাশি উত্তরপ্রজন্মের মাঝে মুক্তিসংগ্রামের মর্মবাণী প্রতিভাত হবে। এই তাগিদ থেকে গড়ে ওঠেছে '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর'। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুস্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জাতির সামনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা তুলে ধরা। এর পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের বাণী প্রচার করা এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ।

এরই আলোকে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত গণহত্যা ও বধ্যভূমির ওপর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি গণহত্যার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা'র উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি পুস্তিকা লেখকের স্বকীয়তা বজায় রেখেও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রণীত হবে। এর বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহীদ ও নির্যাতিতদের নাম-পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন। প্রতিবেদনধর্মী হলেও পুরো কাজটি গবেষণামূলক। উল্লেখ্য, গণহত্যায় সব শহীদের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে প্রতিটি গণহত্যায় যে কজনের নাম পাওয়া গেছে শুধু তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থে অনেক আলোকচিত্র/শিল্পীদের চিত্রকর্মের প্রতিলিপি ব্যবহার করা হয়েছে যা নেয়া হয়েছে অন্তর্জাল ও বিভিন্ন বই থেকে। মুক্তিযুদ্ধের ছবি যেহেতু জনস্বার্থে ব্যবহৃত হয় সে জন্য কখনও কেউ আপত্তি তোলেননি। শিল্পী ও আলোকচিত্রিদের ঋণ আমরা স্বীকার করছি।

এ কাজের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, লেখক গণহত্যা ও বধ্যভূমির স্থলে সরেজমিনে গিয়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে, গণহত্যা সংশ্লিষ্টজনের সঙ্গে কথা বলে, পর্যবেক্ষণ করে– সেই অশ্রু- শোণিতের দিনগুলিকে অন্তরে অনুভব করে তবেই প্রণয়ন করেছেন এই ভাষ্য। সবার হৃদয় নিংড়ানো কথামালা যেন এখানে মেলে ধরেছে ভয়াল দিনের স্মৃতি। ফলে এর মধ্য দিয়ে যে সেই গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অকৃত্রিমরূপে উঠে এসেছে– এ ভরসা আমরা করি।

বর্তমান পুস্তিকা *দামেরখণ্ড গণহত্যায়* বাগেরহাট জেলার সুন্দরবন সন্নিহিত দুর্গম এলাকা মোংলার দামেরখণ্ড গ্রামে সংঘটিত গণহত্যা-নির্যাতনের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ রায় মজুমদার। নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করেও তিনি দামেরখণ্ড গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি এর বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। আমাদের এই প্রয়াসে যুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি ও গণকবর সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চায় এ গ্রন্থমালা বিশেষ আলো ফেলবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে শুধু গৌরব নয়, মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবিধূর কাহিনী তুলে ধরতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উঠে আসবে। এই বেদনা ও গৌরবের কাহিনী বয়ানের মাধ্যমে মানবতার জয়গান করে সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য।

মুনতাসীর মামুন
গ্রন্থমালা সম্পাদক

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে সংঘটিত পাকিস্তানিবাহিনীর আক্রমণ ও নির্যাতনের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের দোসর ছিল রাজাকার, আলবদর ও আলশামসের সদস্যরা। এমন একটি গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে বাগেরহাট জেলার মোংলা থানার দামেরখণ্ড গ্রামে। মে মাসের শেষ দিকে এই গ্রামে অবস্থানকারী প্রায় ৩শ শরণার্থীর উপর নৃশংস আক্রমণ করে প্রায় ৫০ জন নারী-পুরুষকে হত্যা করে রাজাকার বাহিনী। তারা অকথ্য নির্যাতন চালায় ১০-১২ জন নারীর উপর।

দামেরখণ্ড গণহত্যার পরিধি দামেরখণ্ড, মাদুরপাল্টা, নিতাখালী, দোয়ারীজারাসহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামজুড়ে বিস্তৃত। দামেরখণ্ড গ্রামটি লক্ষ্যস্থান এবং সেখানে নিহতের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এটিই দামেরখণ্ড গণহত্যা হিসেবে পরিচিত।

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো হত্যা-নির্যাতনের গতি-প্রকৃতি এখানেও একই রকম। দলবদ্ধভাবে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে লুট, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যা-নির্যাতন শেষে ধর্ষণ দিয়ে শেষ হয়েছে অপারেশন। এই আক্রমণ চালিয়েছিল মূলত একই মহকুমার রামপাল এবং বাগেরহাটের বহিরাগত রাজাকাররা। তাদের সহযোগী হিসেবে অংশ নেয় স্থানীয় রাজাকার বাহিনী। দামেরখণ্ড আক্রমণে ৫০-৬০ জন দুর্বৃত্ত অংশ নিলেও মূল দলে ছিল প্রায় ২০০ রাজাকার। বড় অংশটি মোরেলগঞ্জ থানার জিউধরা ইউনিয়নের লক্ষ্মীখালী গ্রামে গোপাল সাধুর বাড়ি হামলা চালায়। আর এর মূল পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ছিল বাগেরহাট শহরের কুখ্যাত রাজাকার কমাণ্ডার রজ্জব আলী ফকির। দামেরখণ্ড থেকে রামপাল এবং বাগেরহাট সদরের সরাসরি দূরত্ব ১৫ এবং ৩৫ কি. মি.। হত্যার নেশায় এতো দূর থেকে এসেও উন্মত্ত রাজাকাররা তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করেছে। বাগেরহাট জেলার বড় গণহত্যাটি সংঘটিত হয় রামপাল থানার ডাকরা গ্রামে। ডাকরার ঘটনার সঙ্গে দামেরখণ্ড গণহত্যার সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ ওই ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এখানে আক্রমণ হয় এবং আক্রমণকারীরাও ছিল একই দলের সদস্য। তারা দেশীয় অস্ত্র রামদা, লাঠি-রড ইত্যাদির সাথে বন্দুক-রাইফেলও ব্যবহার করে।

অস্ত্রধারী ছাড়া এই হামলায় আরও অংশ নেয় কয়েকশ সাধারণ লুটেরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু হিন্দুদের ধন-সম্পদ লুট করা। অসহায় হিন্দুরা যখন জীবনের মায়ায় ছুটোছুটি করে তখন তাদের কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নেওয়া ছিল সহজ। ফলে এরা হত্যায় অংশগ্রহণ করেনি। কয়েকটি ক্ষেত্রে হিন্দুদের বাঁচাতেও চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওই মুহূর্তে তাদের কাছে

স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ-সম্পত্তির চেয়ে কারও প্রাণরক্ষার বিষয়টি মোটেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তারা লুটের মাল কব্জা করতে গিয়ে জীবনরক্ষায় মন দেয়নি।

মুক্তিযুদ্ধকালীন গণহত্যা থেকে আর একটা বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আক্রান্তদের আত্মরক্ষার বিষয়টি ছিল একেবারেই দুর্বল। এর কারণও রয়েছে। প্রথমত, মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া প্রতিরোধ কার্যক্রম ভেঙে পড়েছিল মে মাসের দিকে। এ সময় প্রায় সারা দেশ পাকিস্তানিবাহিনী ও তাদের দোসররা দখল করে নেয়। সুতরাং মানসিকভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর পুনঃ আক্রমণের শক্তি-সাহস অর্জন না করা পর্যন্ত কোথাও বড় প্রতিরোধ সম্ভব হয়নি। এ সময় স্বাধীনতার পক্ষের সকলে এলাকা ছেড়ে ভারতে অথবা আত্মগোপনে চলে গিয়েছে। তাই এমন সব আক্রমণের ঘটনাগুলো মনে হয় একতরফা। এতে আক্রমণকারীদের নিষ্ঠুরতা ছিল, কোন শক্তি-সামর্থের পরিচয় ছিল না। দ্বিতীয়ত, দুর্ভাগ্যকে কেউ প্রত্যাশা করে না বলে ঘাড়ের উপর এসে না পড়া পর্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে ওঠেনি। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এলাকায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিজ্ঞতা অনেকে ভুলে গিয়েছিলেন। সে সময় অনেক মুসলমান পরিবার বিশেষ করে ঢালীরখণ্ড গ্রামের ইজারাদার পরিবারের ইউনুস আলী ইজারাদার কার্যকর সহায়তা দিতে পেরেছিলেন। একাত্তরে বিভক্তি হয়েছিল স্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষে। ফলে মুসলমানরাও আক্রমণের শিকার হয়ে হিন্দুদের আলাদাভাবে রক্ষা করতে আসেনি। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটনার পরে এসে সহায়তা দিয়েছেন। কীভাবে এমন পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা করা যায় তার কোন উদাহরণ কারও সামনে ছিল না। সবচেয়ে দুর্বল দিক ছিল বাড়ি-ঘরের মায়া ত্যাগ করে সময়মতো ভারতে চলে না যাওয়া। দেখা গেছে, নির্যাতিত না হওয়া পর্যন্ত বহু পরিবার দেশত্যাগ করতে পারেনি বা করেনি। এপ্রিল মাস থেকে দেশে যুদ্ধাবস্থা শুরু হলেও এই এলাকার মানুষ মে-জুন মাসে বাড়ি ত্যাগ করতে শুরু করে। অনেকে জুলাই-আগস্ট মাসেও দেশ ত্যাগ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে দামেরখণ্ড গণহত্যার তথ্য যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে উঠে আসেনি। প্রত্যন্ত এলাকার ঘটনা বলে আঞ্চলিক লেখক-সাংবাদিকেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এতদিন। বাগেরহাটের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্ভরযোগ্য পুস্তক স্বরোচিষ সরকার রচিত *একাত্তরে বাগেরহাট*। এতে দামেরখণ্ড হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। জেলার ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত এলাকার খুঁটিনাটি তথ্য উঠে আসবে এমনটা আশাও করা যায় না। এ ছাড়া শেখ গাউস মিয়া রচিত *মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ : বাগেরহাট জেলা* পুস্তকেও বিষয়টি আসেনি। একমাত্র স. ম. বাবর আলীর *স্বাধীনতার দুর্জয় অভিযান* গ্রন্থে দামেরখণ্ড গণহত্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।

'ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি' সারা দেশে ৯২০টি বধ্যভূমি শনাক্ত করেছে। তারা মনে করে, দেশে পাঁচ হাজারেরও বেশি বধ্যভূমি রয়েছে। এর দুই হাজার বধ্যভূমি উদ্ধার করা সম্ভব। বাকিগুলি উদ্ধার করা সম্ভব নয় এ কারণে যে, সেগুলো পাকাবাড়ি, রাস্তাঘাট ও ক্ষেতখামারের মধ্যে হারিয়ে গেছে। তবে আঞ্চলিকভাবে বধ্যভূমির অবস্থান থেকে মনে হয় এর সংখ্যা দশ সহস্রাধিকও হতে পারে। কেননা সারা দেশে অনুল্লেখ্য রয়েছে অনেক বধ্যভূমি। তবে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ প্রকাশ-প্রকাশনা ও গ্রন্থনার ক্ষেত্রে দেশের দক্ষিণাঞ্চল খুব বেশি উপেক্ষিত।

বস্তুত সংখ্যা দিয়ে একাত্তরের নৃশংসতা ও পাশবিকতার পরিমাপ গ্রহণ করা কঠিন। এখানে প্রতিটি মৃত্যুও প্রতিভাত হয়ে আছে সহস্রের প্রতীক রূপে। যে বীভৎসতার অবতারণা করে খুনিরা বিশ্ববিবেককে স্তম্ভিত করে দিয়েছে তার ইতিহাস সংরক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবিকতার দায়। তাই সকলের দায়িত্ব রয়েছে একাত্তরের প্রত্যেকটি গণহত্যার স্মৃতিভাষ্য তৈরি ও সংরক্ষণে আন্তরিক হওয়া। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অতীতের ঘটনাকে জানতে ও বুঝতে হবে ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন অনুভব করতে পারে স্বাধীনতার জন্য কী মূল্য পরিশোধ করেছে তাদের পূর্বপুরুষ। সেদিক দিয়ে এখনও খুঁজে না পাওয়া বধ্যভূমি এবং গণকবরগুলো শনাক্ত করা খুবই জরুরি।

রাষ্ট্রের শক্তির চেয়ে মানুষের আত্মশক্তির সম্মিলন ও সামাজিক শক্তির জয়গান গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী। এজন্য সামাজিক শক্তির ক্ষমতাকে কার্যকরী করা নাগরিক সমাজের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্যবোধে দেশের প্রত্যেকটি বধ্যভূমি ও গণকবরে স্মৃতিফলক বা স্তম্ভ নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। এভাবে ইতোমধ্যে বহু স্থানে স্মৃতিফলক নির্মিত হয়েছে। তাই সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে একাত্তরের স্মৃতি সংরক্ষণে নাগরিক সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের অনুপুঙ্খ ইতিহাস– ঘটনাপ্রবাহ, তথ্য-মাত্রা ইত্যাদির সমষ্টি এখনও বহুদূর। আঞ্চলিকভাবে, প্রয়োজনে গ্রামকে একক হিসেবে গ্রহণ করে এর চর্চা হতে পারে। আমি দীর্ঘদিন ধরে মোংলা থানার মুক্তিযুদ্ধের আদ্যোপান্ত তুলে আনতে কাজ করছি। 'মুক্তিযুদ্ধে মোংলা' গ্রন্থ প্রণয়নের লক্ষ্যে দামেরখণ্ড গণহত্যার কিছু বৃত্তান্ত ২০১২ সাল থেকে সংগ্রহ করেছি। '১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা' প্রকল্পের জন্য নতুন করে তথ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে মুগ্ধ হয়েছি মানুষের আন্তরিকতায়। একই সাথে গণহত্যা, নির্যাতন, বধ্যভূমি সম্পর্কে সকলের কিছুটা মৌনতাও লক্ষণীয়। তারা মনে করেন সংশ্লিষ্ট বিদ্বৎসমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন এবং গুরুত্বহীন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই কষ্টগুলোকে ভুক্তভোগীরা স্মৃতিচারণে তুলে ধরতে চান না। নির্বিচারে

গণহত্যার প্রতি মানবিক সহানুভূতি সব সময় পাওয়া যায়নি বলে প্রত্যক্ষদর্শীরাও হতাশা প্রকাশ করেন। অনেক সময় স্মৃতিচারণার বিশেষ পর্যায়ে সাক্ষাৎকারদাতা এতোটা আবেগী হয়ে পড়েন যে পরিস্থিতি হয়ে পড়ে বেদনাঘন। মনে হয় এই কষ্টের আগুন কখনওই নির্বাপিত হবে না। বারবার এমন গভীর বেদনাঘন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়াও দারুন কষ্টের। দীর্ঘদিন এর সঙ্গে যুক্ত থেকে ইদানীং দুঃস্বপ্নেও আক্রান্ত হই।

এ গণহত্যার তথ্য সংগ্রহকালে আমি অডিও রেকর্ডার ও ক্যামেরা ব্যবহার করেছি। চেষ্টা করেছি যারা ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শী তাদের সকলের বক্তব্য গ্রহণ করতে কিন্তু দামেরখণ্ড গণহত্যায় এতো বেশিজন নির্যাতিত হয়েছিলেন যে, তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। একটা বিষয় কৌতূহলোদ্দীপক– এই গণহত্যায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের অন্তত দুজন সরল স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে। মকবুল আলী শেখ উপযাচক হয়ে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

কাজের সূত্রে দামেরখণ্ড যতবার গিয়েছি, এমন আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছি যে, মনে হয়েছে তারা নিকট আত্মীয়। এতে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি গণমানুষের শ্রদ্ধাবোধ প্রমাণিত হয়েছে। অজিত শীল, প্রণব মণ্ডল, অসীম কুমার মজুমদার সর্বক্ষণ সাথে থেকে সহায়তা করেছেন। ইস্রাফিল হোসেন ইজারাদার বীরাঙ্গনা তরু শীলকে বিশেষ করে নৈতিক সমর্থন দিয়ে এসেছেন। তার সহায়তায় আমি তরু শীলকে গণমাধ্যমে তুলে ধরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেতে পদক্ষেপ নিতে পেরেছি। তরু শীলকে নিয়ে আমার একটি লেখা *দৈনিক সংবাদ*, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ লেখাটি তরুণদের সংগঠন 'উইথ লিভিং লিজেন্ডস'-কে উদ্দীপ্ত করে। এ সংগঠনের উদ্যোগে ৬ মার্চ ২০১৪ তাঁকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও স্বাধীনতা উৎসব ২০১৪ স্মরণিকায় তরু শীলকে খুঁজে পাওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হয়। আমার ওই লেখাটিও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বীরাঙ্গনাদের তালিকা করে দিয়েছেন অসীম কুমার মজুমদার। দূরে থেকে কার্যকরী সহায়তা দিয়েছেন উজ্জ্বল মণ্ডল। মুক্তিযোদ্ধা প্রসেন গুপ্ত রাতদিন তার মটরসাইকেলে আমাকে যাতায়াতে সহায়তা করে যে উপকার করেছেন তা ধন্যবাদের উর্ধ্বে। মুক্তিযোদ্ধা রহমান আলী শেখ এবং বিশ্বাস রণজিৎ কুমারের কাছেও আমি ঋণী।

পৌষ ১৪২১

সত্যজিৎ রায় মজুমদার
satyaandroy@yahoo.com

ভৌগোলিক অবস্থান

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাট মহকুমা হিসেবে চিহ্নিত হয়। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেরুয়ারি ঘোষিত হয় জেলা হিসেবে। এই জেলার একটি থানা ছিল রামপাল। কথিত আছে, একাত্তরে বাগেরহাট জেলায় সবচেয়ে বেশি রাজাকার ছিল। তার মধ্যে রামপাল থানায় ছিল সর্বাধিক। পরে রামপাল থানার দক্ষিণ অংশ নিয়ে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হয় মোংলা থানা। আর উপজেলা হিসেবে মোংলার পথ চলা শুরু ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩। এই উপজেলা সদর থেকে দামেরখণ্ড পূর্ব দিকে অবস্থিত। মোংলা থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দূরে এটা সুন্দরবন ইউনিয়নের একটি গ্রাম।

প্রায় দুইশ বছর আগে এই এলাকায় বসতি গড়ে ওঠে। তখন বাড়িগুলো রাস্তার দু'পাশে নির্মিত হয়েছিল। অথবা বসতির পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল গ্রামের ছায়াঢাকা কাঁচা পথরেখা। সেই পুরানো পথ মোংলা থেকে শেলাবুনিয়া ও মোংলা কলেজের সম্মুখ থেকে দামেরখণ্ড গ্রামের উপর দিয়ে চলে গেছে। সামান্য পরিবর্তিত হয়ে পূর্ব দিকে এই রাস্তা মিশেছে মোরেলগঞ্জের সাথে। তখন নদী-খালের এতো আধিক্য ছিল যে, রাস্তা নির্মাণও ছিল দুঃসাধ্য। প্রায়শ ভাঙনে রাস্তা নষ্ট হয়ে যেত।

এক সময় পায়েচলা পথের সাথে যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যম ছিল নৌকা। এখন নদী-খাল ভরাট হওয়ার কারণে রাস্তাই একমাত্র যাতায়াতের উপায়।

এখানে জমি একফসলি এবং আমন ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি তাই বেশ দুর্বল। অধিকাংশ মানুষ কৃষক। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। সকলেই প্রায় নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র। দরিদ্রদের পেশা কৃষি শ্রমিক। হাল আমলে চিংড়ি চাষ শুরু হয়ে জীবন ও জীবিকার কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে অর্থনীতিও আগের চেয়ে ভালো। তবে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি এই এলাকায়।

মিশনারিদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য এলাকায় শিক্ষার হার বেড়েছে। দামেরখণ্ড গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম টাটিবুনিয়ায় ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় টাটিবুনিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

লোক বসতির শুরু থেকে নমশুদ্র সম্প্রদায়ের হিন্দুরা এলাকার অধিবাসী ছিল। ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে এবং পাকিস্তান আমলে মুসলমান বসতির শুরু হয়ে বর্তমানে তারা জনসংখ্যার প্রায় আশি ভাগ। একাত্তরে দামেরখণ্ড এবং আশপাশে হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুন্দরবন ইউনিয়নে শিক্ষিতের হার ৭৫%। ভোটার সংখ্যা ১২,৫০০ জন।
সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৫,০০ জন।

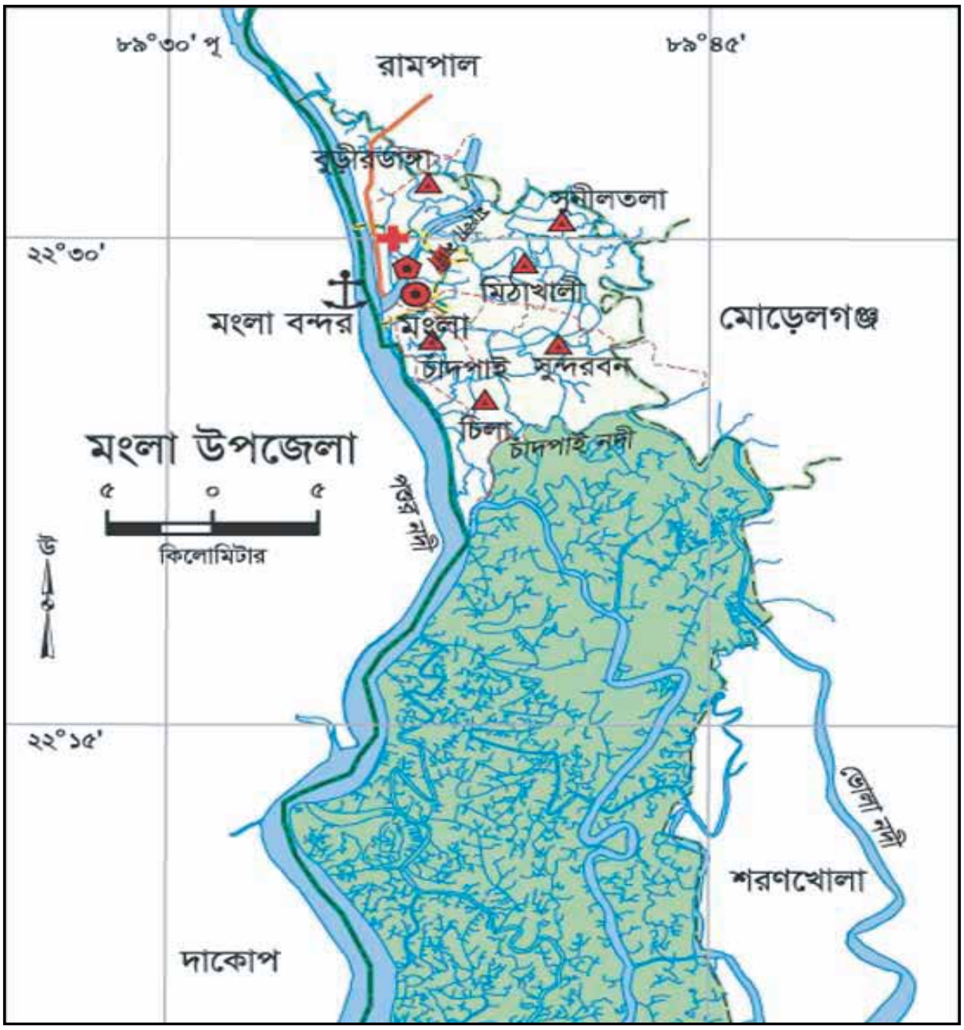

মোংলা উপজেলার মানচিত্র

সৌজন্যে বাংলাপিডিয়া

স্থানটির তৎকালীন অবস্থা

দামেরখণ্ড গ্রামের দক্ষিণে ছিল বড় বিল। বিলের পরে একই ইউনিয়নের বুড়বুড়িয়া এবং মাদুরপাল্টা গ্রাম। পূর্বদিকে ঢালীরখণ্ড গ্রাম এবং পরে মিঠাখালী ইউনিয়ন। উত্তর দিকেও বিল এবং আন্ধারিয়া ও নিতাখালী গ্রাম আর মিঠাখালী ইউনিয়নের অংশ। পশ্চিম দিকে রয়েছে দত্তেরমেঠ গ্রাম এবং মিঠাখালী ইউনিয়ন। বস্তুত গ্রামটির তিন পাশেই মিঠাখালী ইউনিয়ন। গ্রামগুলো পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। একসময় এলাকাটির পশ্চিম দিকে মিঠাখালী-চাঁদপাই সীমানা দিয়ে চাঁদপাই নদী দক্ষিণে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছিল। এর উৎপত্তি ছিল রামপাল থানার খেয়াঘাট পেড়িখালী এলাকার মোংলা নদী থেকে। বর্তমানে এই নদী মৃত। একটি ছোট খালের মতো জলধারা এখনও প্রবহমান। একাত্তরে রামপাল থানার ডাকরা গ্রাম থেকে মান্দারতলার খাল মোংলা নদী থেকে সোজা দক্ষিণে সোনাইলতলা ইউনিয়নের দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত এসে পূর্বে বাঁক নিয়ে প্রবাহিত ছিল। এই বড়খাল বা নদীটি এখনও বর্তমান।

ব্রিটিশ আমল থেকে সমাজ ব্যবস্থায় বহাল ছিল যৌথ পরিবার। এই ব্যবস্থা ভাঙতে শুরু করলেও এখনও বহু যৌথ পরিবার দেখা যায় গ্রামগুলোতে। গ্রামীণ এককে নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ এবং বুদ্ধি-বিবেচনা প্রাধান্য পায়। এই গ্রামে এবং আশপাশের এলাকায় নেতৃত্ব দিয়েছেন দামেরখণ্ড গ্রামের তারাচাঁদ মণ্ডলের ছেলে পরেশনাথ মণ্ডল। দত্তেরমেঠ গ্রামের ভোলানাথ সরকারের ছেলে শান্তিরঞ্জন সরকার এবং ঢালীরখণ্ডের ইউনুস আলী ইজারাদারও প্রভাবশালী ছিলেন।

উনসত্তরে অসহযোগ আন্দোলনের সময় মোংলা এলাকায় নেতৃত্ব দেন গাজী আবদুল জলিল। তিনি মোংলা থেকে মিছিল নিয়ে অনেকবার দামেরখণ্ড গ্রামের কাছে টাটিবুনিয়া স্কুলের মাঠে আসতেন। মোংলায় রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকলেও এখানে এসে টাটিবুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক আবদুল জব্বারের বাড়িসহ অনেকের বাড়িতে অবস্থান করতেন অনেক সময়। এই এলাকায় প্রায় সকলে ছিলেন আওয়ামী লীগের সমর্থক। উত্তর দিকের মিঠাখালী এবং সোনাইলতলা ইউনিয়নে অপেক্ষাকৃত মুক্তিযুদ্ধ ও আওয়ামী লীগ বিরোধীদের সংখ্যা ছিল বেশি।

সত্তরের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে রামপাল-দাকোপ-বটিয়াঘাটা থেকে লুৎফর রহমান এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক নির্বাচনে রামপাল-দাকোপ থেকে কুবের বিশ্বাস জয়লাভ করেন। এই দুই জনই ছিলেন আওয়ামী লীগের সদস্য। কুবের বিশ্বাস ছিলেন নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় নেতা। তিনি এলাকায় বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। ফলে এই দামেরখণ্ড এলাকার প্রতি স্বাধীনতাবিরোধীদের বরাবর একটা আক্রোশ ছিল।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ

একাত্তরে দামেরখণ্ড এলাকা ছিল প্রত্যন্ত জনপদ। বর্ষাকালে চারদিকে ছিলো জল-কাদা, কাঁচা রাস্তা হাঁটার অনুপযোগী। প্রচুর মাছ এবং ধান উৎপাদনের অনুকূল খাল-নদী ও বিল। বসত বাড়িগুলোতে মাটির ভিত, কাঠের বা বাঁশের কাঠামো এবং সুন্দরবনের গোলপাতায় ছাওয়া। পাকা বাড়ি ছিল না বললেই চলে। কোন বাড়িতে নিরাপত্তামূলক বেড়া বা দেওয়াল নেই। ক্বচিৎ দুএকবাড়িতে কাঁটাতারের বেড়া দেখা যায়।

আক্রমণের সময় চারদিক ছিল কিছুটা সিক্ত। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে জোয়ারের জল উঠে আসা খালগুলোতে অষ্টমাসী বাঁধ নির্মাণ করা ছিল এলাকার রেওয়াজ। পাকা ধান নির্বিঘ্নে ঘরে তোলার জন্য এইভাবে কয়েকটি খালে বাঁধ দিলে চারপাশ এবং বিল শুকিয়ে চৌচির হয়ে পড়ে। তখন বিলের মধ্য দিয়ে মানুষ অনায়াসে যাতায়াত করে। এই বাঁধ মে-জুন পর্যন্ত বহাল থাকত। ২৩ মে আক্রমণের সময় পুনরায় বাঁধ কেটে চাষাবাসের মৌসুম শুরু হচ্ছিল। ফলে রাজাকাররা সহজে বিলের মধ্য দিয়ে ছুটে আসতে পারে। খালে প্রবাহ শুরু হলেও বিল ছিল কিছুটা শুকনা।

গণহত্যার পটভূমি

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল পাকিস্তানিবাহিনী বাগেরহাটে প্রবেশ করে ও হামলা চালায়। মার্চ মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানিবাহিনীর দুটি রেজিমেন্ট খুলনায় ঘাঁটি করেছিল। পাকিস্তানি বাহিনি বাগেরহাটের রাজাকারদের আহ্বানে সেখান থেকে বাগেরহাটে ক্যাম্প করে। মে মাসের মধ্যে তারা দেশের থানা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মার্চ মাস থেকে মোংলায় নিয়মিত টহল দিচ্ছিল নৌসেনারা। ৩ এপ্রিল গানবোট থেকে মোংলায় ব্যাপক গোলাবর্ষিত হয়।

বাগেরহাটে পাকিস্তানিবাহিনী বিশেষ করে এদেশের দোসররা প্রথমে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে কাজে লাগায়। আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার কারণে তারা ব্যাপকভাবে প্রচার করে যে, আওয়ামী লীগের কর্মী এবং হিন্দুরা দেশের শত্রু। তাদের খতম করা উচিত। সাধারণ মুসলমানরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথম দিকে সাম্প্রদায়িক আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। এটা বাগেরহাটসহ সারাদেশে ঘটেছিল। জুন মাসের মধ্যে হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলো লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করে তারা।

একাত্তরের মে মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এ সময় এমনকি থানা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল পাকিস্তানিবাহিনী। এর ফলে রাজাকাররা উৎসাহিত এবং সংগঠিত হয়ে হামলা চালাতে শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে শান্তি কমিটি গঠন করে পাকিস্তানপন্থীরা অশান্তির চূড়ান্ত করে ছাড়ে। এই অবস্থায় শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছিল রামপালে। শান্তি কমিটি গঠনের কয়েকটি সভা থেকে রামপাল এলাকায় রাজাকারদের নগ্নভাবে উস্কে দেওয়া হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভায় অংশগ্রহণকারী রাজাকাররা মিটিং শেষ হতেই লুটপাটে নেমে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় ডাকরা, দামেরখণ্ড, লক্ষ্মীখালীসহ সমস্ত রামপালে লুট, হত্যা ও নারী নির্যাতন শুরু হয়।

রামপালে ৬ মে শান্তি কমিটি গঠনের মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাটের রাজাকার নেতারা। তাদের মধ্যে ছিলেন ডা. মোজাম্মেল হোসেন, মোসলেম ডাক্তার, রজ্জব আলী ফকিরসহ আরও কয়েকজন। শান্তি কমিটির সদস্য মোসলেম ডাক্তার মিটিংয়ে বলেন, হিন্দুদের সম্পত্তি লুট করে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত করতে হবে। ডা. মোজাম্মেল হোসেন তার ভাষণে বলেন, 'কোন কথা নয়, লোটপোট খাও।' এরপর রজ্জব আলী ফকির এককাঠি উপরে গিয়ে সরাসরি ঘোষণা করেন, গুলি করো আর হত্যা করো। আমাদের মেজর বলেছেন, হত্যা করতে হবে। আমি আজ সকালে চারটা খুন করে এসেছি। তিনি আরও বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে আমি স্পষ্টভাবে একটি কথাই বলতে চাই, দেশকে রক্ষা করতে হলে হিন্দুদের নিধন করতে হবে, বিতাড়ন করতে হবে। যে যত বেশি হিন্দু মারতে পারবে, তাকে তত বেশি করে হিন্দুর জমি ভাগ করে দেওয়া হবে।'

পাকিস্তানপন্থীদের এই উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের পরই শুরু হয় হামলা। মিটিং শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী হিন্দুপ্রধান এলাকায় লুটপাট করে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের লুটেরা। এ ঘটনার পর অল্প দিনের মধ্যে নিয়মিতভাবে রামপাল থানার সব এলাকায় লুটতরাজ চলে। মালামাল লুট সম্পন্ন হলে তারা ক্রমান্বয়ে হত্যা ও নারী নির্যাতনে মেতে ওঠে। রামপাল থানা সদর থেকে পূর্ব দিকে মোংলা নদীর দক্ষিণ তীরে ডাকরা গ্রাম। ২১ মে রজ্জব আলী ফকিরের রাজাকার বাহিনী রামপালের ডাকরা গ্রামে আক্রমণ করে প্রায় ৭০০ জনকে হত্যা করে। এখানে একটি মন্দিরের সামনে শত শত মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তারা। এর দুইদিন পর ২৩ মে আক্রান্ত হয় লক্ষ্মীখালী এবং দামেরখণ্ড গ্রাম।

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

দামেরখণ্ড গণহত্যা ঘটে একাত্তরের ২৩ মে। এদিন দুপুরের পর থেকে রাত পর্যন্ত বাগেরহাট এবং রামপালের রাজাকাররা দামেরখণ্ড ও আশপাশের বিশাল এলাকা জুড়ে হত্যা, নারী নির্যাতন ও লুটতরাজ চালায়। এতে অংশ নেয় স্থানীয় রাজাকাররা। রামপালের ডাকরায় ২১ মে এই রাজাকারদের হত্যাযজ্ঞে উগ্র মূর্তি দেখে সকলে মনে করে, এদের সামনে কেউ নিরাপদ নয়। তখন দক্ষিণ রামপালের হিন্দুপ্রধান এলাকা থেকে সকলে ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতে যাওয়ার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ রুট ছিল সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নদীপথে। ফলে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে ৩-৪শ লোক দামেরখণ্ডের বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নেন। এই খবর পেয়ে রজ্জব আলীর বাহিনী বড় দোতলা লঞ্চে অস্ত্রপাতি বোঝাই করে সোনাইলতলা চলে আসে। ২১ মে-র আক্রমণে তারা প্রচুর সম্পদ– টাকা-পয়সা ও সোনাদানা দখল করতে পেরেছিল। ফলে একই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় তারা উৎসাহিত হয়েছিল এমন আক্রমণে।

বাগেরহাট থেকে সকালে যাত্রা করে রাজাকার বাহিনী দুপুর বেলা জোয়ারের সময় চলে আসে মোংলার সোনাইলতলা ইউনিয়নে। রামপাল থেকে ‘মান্দারতলার খাল’ নামে ছোট নদীপথে খুব সহজে এসে সেখানের স্থানীয় রাজাকার কমান্ডার রুস্তম হাওলাদারের বাড়ির পাশে থামে লঞ্চটি। তখন এলাকার প্রায় ৩০-৪০ জন রাজাকার তাদের দলে যোগ দিতে লঞ্চের কাছে গেলে রজ্জব আলী ফকির নেমে এসে বলেন, ‘লঞ্চে জায়গা নেই, তোমরা হেঁটে যাও।’ এ প্রসঙ্গে সোনাইলতলা ইউনিয়নের আমড়াতলা গ্রামের খোরশেদ আলী শেখ বলেন, ‘আমরা হেঁটে গিয়ে দেখলাম যে, লঞ্চটা নেপালের দোহায় ভিড়ল। প্রথমে লোকজন নামল পরে নামানো হল অস্ত্রপাতি। একটা বড় ছোরা হাতে নিয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিল রজ্জব আলী ফকির। আমি তার পাশে পাশে ছিলাম।’ খোরশেদ আলী শেখের ছোট ভাই মকবুল আলী শেখ দাবি করেন, তারা আমড়াতলার রুস্তম হাওলাদারের বাড়ির কাছ থেকেই লঞ্চে ওঠে। হতে পারে যে, একদল সেখান থেকে এবং অন্যদল কিছুদূর হেঁটে গিয়ে লঞ্চে উঠেছিল। তবে দোতলা লঞ্চটি ভর্তি হয়ে এসেছিল রাজাকাররা।

পরামানিক বাড়ি। এই বাড়িতে বীরেন পরামানিকসহ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়

দামেরখণ্ড গণহত্যা ছিল পরিকল্পিত। উল্লেখযোগ্য কোন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে তার ছক কষে আসে হত্যাকারীরা। প্রথমে তারা ধনখালী গ্রামে নেমে গুলি শুরু করে। ওই গ্রামে কয়েকটা বাড়িতে আগুন দেয়। প্রাণভয়ে যখন লোকজন ছুটে পালাতে শুরু করে তখন তাদের হত্যা করা হয় গুলি করে। আক্রমণের প্রথম থেকেই দলটি কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। রজ্জব আলী ফকির যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। আর দুই পাশ দিয়ে অন্যরা বাড়িঘরের মধ্য দিয়ে লুট ও হত্যা চালিয়ে যাচ্ছিল। সাথে সাথে ভস্মিভূত করে যাচ্ছিল ঘরগুলোকে। যারা দৌড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তাদের গুলি করা হয়। আর যারা বিলে-খালে, বাগানে লুকায় তাদের খুঁজে বের করে ছোরা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে রাজাকাররা।

সিকি সোনাইলতলা গ্রামের খোরশেদ আলী শেখ বলেন, একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে আসে কয়েকজন। তার গায়ের রঙ কালো। দেখতে মোটামুটি সুন্দরী। তার নাম ছিল কমলা। সে বারবার বলছিল আমাকে ছেড়ে দেও, আমার কাছে একটা জিনিস আছে তোমাদের দেব। তাকে ধরে নিয়ে রাজাকাররা আরও কয়েকটা বাড়ি আগুন দেয়ার পরও সে কিছু দিতে পারে না। কমলার কাছে তেমন কিছুই ছিল না। বাঁচার জন্য সে ওই কথা বলছিল। গুলিতে সেও প্রাণ হারায়।

পরেশনাথ মণ্ডল এই খালে ২০-২৫টি লাশ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন

অন্যদিকে একদল আধপাগল একটা লোককে তাড়া করে নিয়ে আসে। রজ্জব আলী বলেন, এই দাঁড়া, এদিকে আয়। সে কাছে আসলে বলেন, তুই হিন্দু না মুসলমান? সে বলে মুসলমান। তখন রজ্জব আলী বলেন, লুঙ্গি উঠা। তারপর সে বলল, আমি নয়া মুসলমান। এ কথা বলার সাথে সাথে বুকে ধাক্কা দিয়ে তার কপালে গুলি করে রজ্জব আলী ফকির। সে পথের পাশে জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে মারা যায়। এ সময় ধনখালীর গুরুদাস মাঝিকে গুলি করে হত্যা করে তারা। একই গ্রামের কালো মণ্ডল অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দৌড়ে গিয়ে এক মুসলমান বাড়ি আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে সে মুসলমান হিসেবেই সেখানে রয়ে যায়।

রুস্তম হাওলাদার ও রজ্জব আলী ফকির দল নিয়ে গুলি করতে করতে আর আগুন দিতে দিতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যায়। আর অন্যরা বিলের মধ্য দিয়ে যায় দক্ষিণে দামেরখণ্ডের দিকে। গণহত্যার বর্ণনা দিয়ে দামেরখণ্ড গ্রামের প্রণব মণ্ডল জানান, রজ্জব আলীর দল হত্যাকাণ্ডে নামার আগে সোনাইলতলা ইউনিয়নের খোনকারবেড় গ্রামে জগবন্ধুর বাড়ি দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করেছিল। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এমনকি তার মেয়েকে মুসলমান বাড়ি বিয়ে দিতে হয়। আজও মেয়েটা সেই বাড়িতেই সংসার করছেন।

দামেরখণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়া দলটি নিতাখালী গ্রামে দ্বিজবর মণ্ডলের বাড়ি আগুন লাগায়। আকস্মিক আক্রমণে দিশেহারা হয়ে লোকজন বিভিন্ন দিকে ছুটে পালাতে থাকে। কিছু

লোক রিক্তহস্তে বিল পাড়ি দিয়ে সোজা দক্ষিণে দামেরখণ্ডের দিকে চলে আসে। রাজাকাররা তাদের ধাওয়া করে উঠে আসে দামেরখণ্ড। তাদের হাতে ছিল মশাল ও অস্ত্রপাতি। তারা 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি দিয়ে এমনভাবে ধেয়ে আসে যে, দামেরখণ্ড গ্রামের অধিকাংশ লোকজন পালানোর সুযোগ পাননি। গ্রামে উঠে এখানেও উপদলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন বাড়িতে হত্যা নির্যাতন শুরু করে রজ্জব আলীর বাহিনী।

দামেরখণ্ড গ্রামের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অশোক কুমার মণ্ডলদের বাড়ির পাশে একটি খাল এখনও বর্তমান। হত্যাকারীরা এই খালের পশ্চিমে আক্রমণ করেনি। তারা ক্রমান্বয়ে দক্ষিণে ও পূর্বে অগ্রসর হয়। অশোক কুমার মণ্ডল বলেন, নেপালের দোহার কাছে ছিল তার মাসিমাদের বাড়ি। সে বাড়ির ছেলে দুলাল রায়কে রাজাকাররা কৌশলে সাথে করে নিয়ে আসে। সে তখন ছোট। বুঝতে পারেনি যে, কেন তাকে সাথে নিয়ে আসছে। গ্রামে এসে অশোক কুমার মণ্ডলের ঠাকুরদাদাদের নাম করে তাকে জিজ্ঞাসা করে শশীভূষণ কে? রসিকলাল কে? তারা ছিলেন এলাকার বিশিষ্টজন। দুলাল তাদের দেখিয়ে বলে, ওই যে। তখন তাদের দুজনকে এবং মৌখালী গ্রামের সতীশ চৌকিদারকে ধরে বাড়ির সামনে কালভার্টের কাছে নিয়ে দাঁড় করায়। তাদের গুলি করে দামেরখণ্ড গ্রামে হত্যা শুরু করে রাজাকাররা। গুলি খেয়ে তারা রাস্তার দক্ষিণ পাশে জলায় পড়ে যান। বুকে গুলি খেয়েও ভাগ্যক্রমে বেঁচে ছিলেন রসিকলাল মণ্ডল। খালের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে একটু দূরে তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো বুকে মাটি চেপে ধরে চলে যান অন্য দিকে। বাকি দুজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। মারাত্মক আহত হয়ে কিছুদিন পরে রসিকলাল মণ্ডল মারা গিয়েছিলেন।

এর আগে ২২ মে রাতে ৩ মাইল পশ্চিমে মৌখালী গ্রামে আগুন লাগায় স্থানীয় লুটেরা। এই গ্রামের প্রায় সব হিন্দু পরিবার ছিল ধনী। তাদের অত্যাচারে মৌখালী, দত্তেরমেঠ ইত্যাদি গ্রাম থেকে নিঃস্ব অবস্থায় বহু পরিবার দামেরখণ্ড এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে তারাও আক্রান্ত এবং নিহত হন। অশোক কুমার মণ্ডল বলেন, তাদের বাড়িতে প্রায় ৫০ জন আশ্রয় গ্রহণ করে। আক্রমণকারী রাজাকাররা পশ্চিম পাশের ভিটায় তাদের ২০-২৫ জনকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে। নিরীহ মানুষগুলো সেখানের ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়েছিল প্রাণভয়ে। বাগান থেকে তাদের কাউকে কাউকে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে বের করে নৃশংসভাবে হত্যার পর 'হালোট' এবং ভিটার উপর ফেলে রাখে। একদিন পর পরেশ নাথ মণ্ডল বাড়ি ফিরে বাঁশ দিয়ে ঠেলে শবগুলো জোয়ারের জলে ভাসিয়ে দেন। তাদের সকলের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।

অশোক কুমার মণ্ডলের পিতা পরেশনাথ মণ্ডল ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তি। বিপদের দিনে পাড়ার সকলে তাদের বাড়ি আশ্রয় নেয়ার জন্য এগিয়ে আসছিল। কিন্তু প্রথমেই সে বাড়িতে হত্যাকাণ্ড ঘটায় ওই বাড়িতে কোন লোক ছিল না এবং আগত সকলে সেই বাড়ির পাশে বাগানে অবস্থান করে। প্রতিবেশি নকুলেশ্বর মণ্ডলের পরিবারও সেই বাগানে ছিল। সেখানে একটা শুকনা পুকুরে ছিল কচুবন। নকুলেশ্বর মণ্ডল ও নিশিকান্ত মণ্ডল আপন দুই ভাই ছিলেন কচু বাগানে। রাজাকাররা তাদের কাছে গিয়ে একটি কাঁথা ইত্যাদির পোটলাকে লাথি দিয়ে পুকুরে ফেলে দিলে নিশিকান্ত মণ্ডল উঠে দৌড় দেন। তখন নকুলেশ্বর মণ্ডলকে ধরে বলে, টাকা দে। বলেই ছোরা দিয়ে কোপাতে থাকে। তিনি হাত দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করলে বিভিন্ন স্থানে আহত হন। পরে ভীষণ জোরে পেটে কোপ দিলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয় এবং তিনি পড়ে যান। এই ঘটনা নকুলেশ্বর মণ্ডলের স্ত্রী-পুত্রবধূরা সকলে কাছের বাগানে বসে দেখেন। তার পুত্ররা শরৎ মণ্ডল এবং চিত্ত মণ্ডল দুইভাই একজন বাঁশগাছে আর একজন একটা গাব গাছে বসে অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, মাটিতে পড়ে তিনি জল জল বলে আর্তনাদ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অথচ রাজাকারদের অবস্থানের কারণে তখনও কেউ কাছে আসতে পারেননি।

হত্যাগুলো খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়। কয়েকজন অস্ত্রধারী প্রায় একই সময়ে পূর্ব পার্শ্বের পরামানিকবাড়ি ছোরা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে বীরেন পরামানিককে। সে ছিল শক্ত-সমর্থ বিরাট জোয়ান পুরুষ এবং প্রচণ্ড সাহসী। আত্মগোপনের পরিবর্তে অনেকটা অবহেলার ভঙ্গিতে বলেছিল, তাকে কিছু বলবে না। খেপলা জালে মাছ ধরে এসে সে বাড়ির উঠোনে একটি জাম গাছে জাল মেলে দিচ্ছিল। পেছন থেকে এসে তার ডান পাশের পেটে আঘাত করে এক রাজাকার। এ প্রসঙ্গে একই বাড়ির সুধন্য রায়ের স্ত্রী প্রমিলা রায় বলেন, হঠাৎ বিলের মধ্য দিয়ে রজ্জব আলীর দল চলে আসে। রাজাকাররা তার পেছন দিকে থেকে পেটের পাশে ছোরা ঢুকিয়ে দেয়। আমি ঘরে শুয়ে দেখছি খুনীদের কাপড়ে রক্ত। লুঙ্গি রক্তে ভিজে গেছে। আমার ছেলেমেয়েরা চেঁচাচ্ছে আর আমাকে ডাকছে। ওদের কাকা দেবী প্রসাদ রায়কে পিটাচ্ছে আর ওরা তাকে নিয়ে ঘুরছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে উঠোন। তবু হাতে পায়ে বল পাচ্ছিলাম না উঠে চলে যাওয়ার জন্য। অন্য ঘরে তার দেবর সতীশ রায় মাথায় টুপি দিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে। যখন শোনা গিয়েছিল যে হিন্দুদের মেরে ফেলবে তখন জামার হাতা কেটে তিনি টুপি বানিয়ে দেন।

বীরেন পরামানিকের এক ভাই কুমুদ পরামানিক পরিবার নিয়ে দক্ষিণের গ্রাম মাদুরপাল্টা চলে গিয়েছিল। বীরেন পরামানিকের স্ত্রী রেনুকা পরামানিক বলেন, সেদিন ছিল রবিবার। গুলি, আগুন আর মানুষের মরণ চিৎকারের শব্দে কোন জ্ঞান ছিল না আমার। সকলে যার যার মতো দৌড়ে পালাচ্ছিল। আমি মাত্র কয়েকদিনের ছেলেটাকে বুকে ধরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদছিলাম। কারণ ওর বাবা বাড়িতে ছিল না। হঠাৎ ওর বাবা দৌড়ে এসে ছেলেটাকে আমার কাছ থেকে নিল। তারপর দক্ষিণ দিকে বিলের মধ্যে পড়ে দৌড়োলাম। শতশত মানুষ দৌড়োচ্ছিল। আমরা বেশ দূরে মাদুরপাল্টা গ্রামে চলে গেলাম। হঠাৎ সেখানেও কিছু রাজাকার আমাদের ঘিরে ধরল। দামেরখণ্ড থেকে যারা পালাচ্ছিল তাদের তাড়া করে ওরা মান্দুরপাল্টা পৌঁছে যায়। তারা প্রায় ২০-২৫ জন হবে। তাদের হাতে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র। আমরা দিশেহারা হয়ে পাশের শিকদার বাড়ি ঢুকে পালাতে চেষ্টা করি। রাজাকাররাও বাড়ি ঢুকে তাদের পুকুরপাড়ে আমাদের ধরে ফেলে। প্রথমে এক রাজাকার বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে। আমি চিৎকার করে আমার স্বামীকে জড়িয়ে ধরি। তখন আর এক রাজাকার আমাকে জোর করে টেনে ছাড়ানোর সাথে সাথে পাশ থেকে আমার স্বামীর বুকে গুলি করল একজন। বুকে গুলি খেয়ে তিনি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এতেও ক্ষান্ত হয়নি হামলাকারীরা। তাকে টেনে তুলে বড় দা দিয়ে বুকে-পিঠে কোপাতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি মারা যান। সেখানে রাজাকাররা অজিত মণ্ডল, ভক্ত মাঝি, কাঙ্গাল মণ্ডলসহ কয়েকজনকে হত্যা করে।

বীরেন পরামানিককে হত্যার পর তারা পাশের বাড়ির দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে তাড়া করে। তিনি বাড়ি থেকে দৌড় দিয়ে দক্ষিণে রাস্তার দিকে যাচ্ছিলেন। পথের পাশে ছিল পুকুর। সেই পুকুরের পাশে সরু রাস্তা ও হারগুঁজি কাঁটা বাগান। তিনি সেই বাগানে পড়ে গিয়ে লুকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজাকাররা তাকে টেনে তুলে রামদা দিয়ে মাথায় ভীষণ জোরে কোপ দেয়। এক কোপেই মাথার ঘিলু বের হয়ে গিয়েছিল। ওই অবস্থায় রাজাকাররা তাকে ফেলে ছুটেছিল অন্যদের ধরতে। দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল এরপর মাস খানেক বেঁচেছিলেন।

এ সময় শহীদ গীতিশ মণ্ডলের মা-বোনসহ চারজন মহিলা ও যুবতীকে নির্যাতন করে হত্যাকারীরা। তাদের ধরে পরেশনাথ মণ্ডলের ফাঁকা ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। তারা আগের দিন এই গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন এখনও বেঁচে আছেন। গিতীশ মণ্ডলকে ধরে নিয়ে অন্য গ্রামে হত্যা করে তারা।

হত্যা-নির্যাতন শুরু হলে পূর্ব দিকের বাড়িগুলো থেকে লোকজন পূর্ব-পশ্চিমের রাস্তা ধরে পূর্বদিকে ছুটছিল। কিছু লোক তাদের মুসলিমপ্রধান ঢালীরখণ্ড গ্রামে ঢুকতে দিল না। তখন শতশত লোক ডান দিকের বিলে পড়ে দৌড়াতে থাকে। সেই সাথে দুলাল কুমার রায়ের পরিবার চলে গেল সাহেবেরমেঠ গ্রামের পাশে। সেখানেও তিন হত্যাকারী পৌঁছে যায়। তাদের দুইজনের হাতে বন্দুক, একজনের হাতে ছিল বড় ছোরা। এদের একজন স্থানীয়। সেখানে বাবুরাম নামে একজন রাজাকারদের পায়ে ধরে প্রাণভিক্ষা চাইতে নিচু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় গুলি করে। তার খুলি উলটে যায়। সে 'মাগো' বলে উপুড় হয়ে পড়ে। বাবুরাম পড়ে গেলে তারা দুলাল কুমার রায়ের ঠাকুরদা সহদেব রায়ের কাছে আসে। তার নাতি-নাতনি ও পুত্রবধূরা তাকে জড়িয়ে ধরে প্রাণভয়ে কাঁদতে থাকে। খুনীরা তাদের কান্নাকাটি দেখে নরম হয়ে একটু দূরে চলে যায়। স্থানীয় রাজাকারের আগ্রহে আবার কাছে এসে কাঁধের কাছে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে সহদেব রায়কে। তিনি 'মা-মা' বলে পড়ে যান। রক্তে ভিজে যায় তার নাতি-নাতনি ও পুত্রবধূরা। হত্যাকারীরা পরে ঢালীরখণ্ডের দিকে যায়।

দামেরখণ্ড গণহত্যা সম্পর্কে স. ম. বাবর আলী *স্বাধীনতার দুর্জয় অভিযান* গ্রন্থে লিখেছেন, 'পূর্ব পরিকল্পনা মতো একদল পশ্চিম দিক থেকে দত্তেরমেঠের সতীশ চৌকিদারের বাড়িতে আগুন দিল। আর এক দল পূর্ব দিকে নিতাখালী গ্রাম থেকে শুরু করল আক্রমণ। ... জেলেরা যেমন জালে আটকানো মাছগুলি গুছিয়ে একখানে করে তেমনি এখানেও সেই অবস্থা। এরপর দুই দিক থেকে এসে রাজাকারসহ স্থানীয় পাকিস্তানি সমর্থকরা শুরু করল গুলি। দ্রাম-দ্রাম ফটফট, শুধু গুলির শব্দ। আর আর্ত পীড়িতদের করুণ আর্তনাদ।'

গণহত্যার সময় নারী নির্যাতন ঘটেছিল। দামেরখণ্ড গণহত্যার সময় বহু নারী শিশুসন্তানদের নিয়ে আত্মগোপন করেছিল আশপাশের কাঁটা বাগানগুলোতে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে বিলের পাশে বালাবাড়ি ছিল একটি বড় বাগান। সেখানে অনেকে অবস্থান করছিল। দামেরখণ্ডের তরু শীলও সেখানে অবস্থান করে। রাজাকাররা প্রথমে তাকে নিয়ে যেতে চায়। সহজে যেতে না চাইলে বেদম প্রহার করে। তার শাশুড়ি পুত্রবধূকে অপহরণে বাধা দিলে তাকেও পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে। তারপর তরু শীলকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। তরু শীলের সাথে তারা একজন যুবককে ধরে নিয়েছিল। তাকে পথে গুলি করে হত্যা করে। তরু শীলকে বাগেরহাটে রজ্জব আলীর এবং অন্য একটি বাড়িতে প্রায় চার মাস আটকে রেখে

নির্যাতন করা হয়। এ সময় মাদুরপাল্টার আনন্দ মণ্ডলের মেয়ে শোভা রানী মণ্ডলকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে এই বাহিনী। নিতাখালী গ্রামের নিখিল মণ্ডলের মেয়ে রীনা মণ্ডলও নির্যাতনের শিকার হন। বিধ্বস্ত অবস্থায় তিনি দামেরখণ্ড গ্রামের এক আত্মীয় বাড়িতে একরাত অবস্থান করে ভারতে চলে যান। নির্যাতনের শিকার হন ঢালীরখণ্ড গ্রামের ওহাব ফকিরের স্ত্রী রহিমা খাতুনও। এছাড়া নিতাখালীর শশীভূষণ মণ্ডলকে ধরে নিয়ে হত্যার পর তার মেয়ে নমিতা মণ্ডলকেও ধরে নিয়ে যায়। তাকে কোথায় নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে তা জানা যায়নি।

গণহত্যা-নির্যাতনকারীরেদের পরিচয়

দামেরখণ্ড গ্রামে আক্রমণকারীদের বেশিরভাগ ছিল বহিরাগত। এজন্য তাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে বাগেরহাটের রাজাকার কমান্ডার রজ্জব আলী ফকিরের সরাসরি পরিচালিত দলের সদস্য এবং রামপাল থানার রাজাকাররা এতে অংশ নেয়। স্থানীয়ভাবে উত্তর দিকের সোনাইলতলা ইউনিয়নের আমড়াতলা গ্রামের রাজাকার রুস্তম হাওলাদার পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন দলটিকে। তিনি ছাড়াও দলে সোনাইলতলা গ্রামের আরও কয়েকজন রাজাকার ছিলেন। তবে ওই এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের বহু লোক লুটেরা হিসেবে দলে যোগ দেয়।

রজ্জব আলী ফকির: রজ্জব আলী ফকির ছিলেন বাগেরহাট সদর থানার ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের পাটরপাড়া (দিঘিরপাড়) গ্রামের অধিবাসী। পিতার নাম ছুটে ফকির। একাত্তরে তিনি ছিলেন ষাটগম্বুজ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান। তার বাড়ির পাশেই অবস্থিত খান জাহান আলীর মাজার। খাদেম হিসেবে এই মাজার ঘিরে বিপুল পরিমাণ আয় নিয়ন্ত্রণ করতেন রজ্জব আলী ফকির। এজন্য তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বেশ মজবুত।

একাত্তরের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ডা. মোজাম্মেল হোসেনকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় ২৩ সদস্যের শান্তিকমিটি। এই কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। এপ্রিল মাসে সংগ্রাম কমিটি নিয়ন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধারা বাগেরহাট ছেড়ে গেলে রজ্জব আলীর নেতৃত্বে গঠিত হয় সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী। এই বাহিনীর নৃশংসতা সকল নজির ছাড়িয়ে যায়। তার কর্মতৎপরতায় খুশি হয়ে মাওলানা এ কে এম ইউসুফ মে মাসেই তাকে 'রাজাকার মেজর' উপাধি প্রদান করেন।

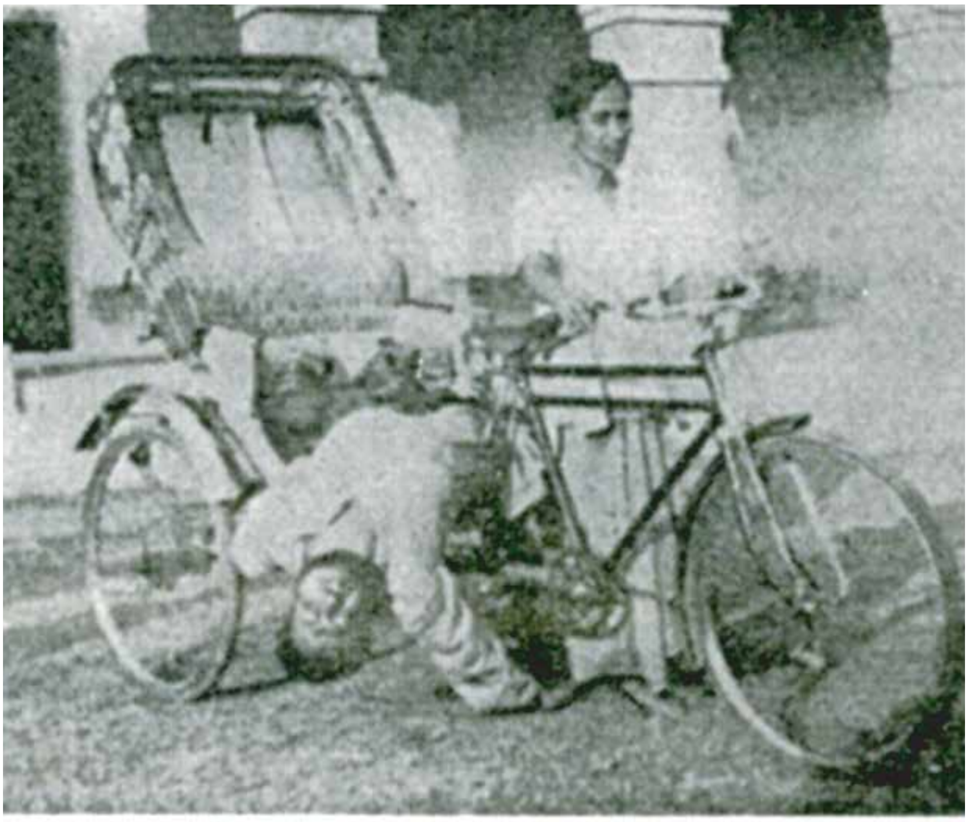

আত্মহত্যার পর রাজাকার রজ্জব আলীর লাশ নিয়ে আসা হচ্ছে রিকসায় করে

এজন্য তার নিষ্ঠুরতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। কথিত আছে, রজ্জব আলী প্রতিদিন নাস্তার আগে ১০ জন স্বাধীনতাকামী মানুষকে হত্যা করতেন। তার নেতৃত্বে বাগেরহাট জেলার ডাকরা, লক্ষ্মীখালী, দামেরখণ্ডসহ বহু স্থানে গণহত্যা সংঘটিত হয়। তিনি নিজে মুক্তিযোদ্ধাসহ শতশত সাধারণ মানুষকে হত্যা করেন। হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ইত্যাদি কুকর্মের জন্য রজ্জব আলীকে হত্যার পরিকল্পনা করেন মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে মারাত্মক আহত হয়েও অল্পের জন্য তিনি বেঁচে যান।

ডিসেম্বর মাসের প্রথমে পাকিস্তানবাহিনী বাগেরহাট ত্যাগ করে। কিন্তু স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত বাগেরহাটের নিয়ন্ত্রণ রজ্জব আলী তার হাতে রেখেছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে তিনি ডাকবাংলোর সামনে রাজাকারদের সভা ডাকেন। সেখানে রাজাকারদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে আত্মগোপন করেন। মুক্তিযোদ্ধারা জীবিত ধরতে গিয়ে তার লাশ খুঁজে পান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখবেন না বলে তিনি আত্মহত্যা করেন। তার অত্যাচার এতোটাই মাত্রা ছাড়িয়ে ছিল এবং তার প্রতি মানুষের এতোটাই ঘৃণা জমেছিল যে, উত্তেজিত জনতা শূলের মতো বাঁশের উপর তার লাশ বিদ্ধ করে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল ভাঙা হারিকেন।

রুস্তম হাওলাদার : রুস্তম হাওলাদারের বাড়ি মোংলা থানার সোনাইলতলা ইউনিয়নের আমড়াতলা গ্রামে। পিতার নাম আঃ করিম হাওলাদার। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা আঃ হামিদ শেখ জানান, একাত্তরে তার বয়স ছিল প্রায় ৪৪ বছর। রুস্তম হাওলাদার অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তার পিতার তিন স্ত্রীর গর্ভে ছিল ৫ পুত্র সন্তান ও কয়েকজন কন্যা সন্তান। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ভালো। পিতা মুসলিম লীগের প্রভাবশালী সমর্থক ও কর্মী থাকায় একই আদর্শে সন্তানরা রাজাকার হয়ে ওঠেন। পঁচাত্তরের পর তিনি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনের প্রতিও হুমকি হয়ে দাঁড়ান। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা তাকে মদ ও নারী পরিবেষ্টিত অবস্থায় হত্যা করেন।

শহীদদের তালিকা ও পরিচয়

ক্রমিক	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১	শশীভূষণ মণ্ডল	কার্তিক মণ্ডল	দামেরখণ্ড	সুন্দরবন
২	নকুল মণ্ডল	সম্ভুরাম মণ্ডল	দামেরখণ্ড	সুন্দরবন
৩	কুমুদ পরামানিক	দ্বিজবর পরামানিক	দামেরখণ্ড	সুন্দরবন
৪	বীরেন পরামানিক	দ্বিজবর পরামানিক	দামেরখণ্ড	সুন্দরবন
৫	রসিকলাল রায়	রামধন রায়	দামেরখণ্ড	সুন্দরবন
৬	সন্তোষ মজুমদার	নিত্যানন্দ মজুমদার	দামেরখণ্ড	সুন্দরবন
৭	হরিপদ মণ্ডল	দোয়ারী মণ্ডল	দামেরখণ্ড	সুন্দরবন
৮	কাঙ্গাল মণ্ডল	হারাণ মণ্ডল	দামেরখণ্ড	সুন্দরবন
৯	দেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল	অতুল মণ্ডল	দামেরখণ্ড	সুন্দরবন
১০	সহদেব রায়	পূর্ণচন্দ্র রায়	দামেরখণ্ড	সুন্দরবন
১১	বাবুরাম মণ্ডল	ভাগ্যধর মণ্ডল	তেঘরিয়া	সুন্দরবন
১২	সুরাজ বৈরাগী	রসিকলাল বৈরাগী	তেঘরিয়া	সুন্দরবন
১৩	শচীন বৈরাগী	রসিকলাল বৈরাগী	তেঘরিয়া	সুন্দরবন
১৪	নগেন্দ্রনাথ মহলদার	গুরুচরণ মহলদার	দিগরাজ	সুন্দরবন
১৫	সহদেব কীর্তুনিয়া	পাঁচুরাম কীর্তুনিয়া	নিতাখালী	মিঠাখালী
১৬	মহানন্দ গাইন	বলরাম গাইন	নিতাখালী	মিঠাখালী
১৭	নরেন মাঝি	কালিপদ মাঝি	নিতাখালী	মিঠাখালী
১৮	বিনোদ মাঝি	কালিপদ মাঝি	নিতাখালী	মিঠাখালী
১৯	অনন্ত ঠাকুর	-	নিতাখালী	মিঠাখালী
২০	দিনরজনী মণ্ডল	প্রসন্ন মণ্ডল	নিতাখালী	মিঠাখালী
২১	সুধীর চক্রবর্তী	জগবন্ধু চক্রবর্তী	নিতাখালী	মিঠাখালী
২২	মহানন্দ মণ্ডল	রাম মণ্ডল	নিতাখালী	মিঠাখালী
২৩	মৃগেন মৃধা	বসন্ত কুমার মৃধা	মৌখালী	মিঠাখালী
২৪	অজিত মণ্ডল	রাজেন মণ্ডল	মৌখালী	মিঠাখালী
২৫	গীতিশ মণ্ডল	শশীভূষণ মণ্ডল	দত্তেরমেঠ	মিঠাখালী
২৬	সতীশ মণ্ডল	নবীন মণ্ডল	দত্তেরমেঠ	মিঠাখালী

২৭	ধীরেন মণ্ডল	সতীশ মণ্ডল	দত্তেরমেঠ	মিঠাখালী
২৮	রমণীকান্ত কীর্তুনিয়া	মধুসূদন কীর্তুনিয়া	দত্তেরমেঠ	মিঠাখালী
২৯	রণজিৎ মলোঙ্গী	অশ্বিনী মলোঙ্গী	দত্তেরমেঠ	মিঠাখালী
৩০	ভূবন মণ্ডল	বিপিন মণ্ডল	সাহেবেরমেঠ	মিঠাখালী
৩১	কালিপদ মাঝি	সুখচাঁদ মাঝি	নিতাখালী	মিঠাখালী
৩২	রসিকলাল মাঝি	সুখচাঁদ মাঝি	-	-
৩৩	রসিকলাল গোলদার	-	নিতাখালী	মিঠাখালী
৩৪	অরুন মল্লিক	গুড়ে মল্লিক	মাদুরপাল্টা	সুন্দরবন
৩৫	গুরুদাস মাঝি	মহাদেব মাঝি	ধনখালী	সুন্দরবন
৩৬	ক্ষিতিশ মণ্ডল	শশীভূষণ মণ্ডল	দত্তেরমেঠ	সুন্দরবন
৩৭	রসিক মণ্ডল	কার্তিক মণ্ডল	দত্তেরমেঠ	সুন্দরবন

(অসম্পূর্ণ)

ভূক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা

দামেরখণ্ড গণহত্যায় নির্যাতিত অনেকেই বেঁচে আছেন। নিহত এবং নির্যাতিতদের বেশিরভাগ ছিলেন এই গ্রামের। ফলে এই গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী এবং নির্যাতিত অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রমিক	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	বিবরণ
১	তরু শীল	অজিত শীল	দামেরখণ্ড	আটকে রেখে নির্যাতন
২	রেনুকা পরামানিক	কুমুদ পরামানিক	দামেরখণ্ড	স্বামীকে হত্যা
৩	প্রণব মণ্ডল	নকুলেশ্বর মণ্ডল	দামেরখণ্ড	ঠাকুরদাকে হত্যা
৪	দুলাল রায়	সুবোধ রায়	দামেরখণ্ড	ঠাকুরদা ও কাকাকে হত্যা
৫	সিদ্ধার্থ মলোঙ্গী	রণজিৎ মলোঙ্গী	দোয়ারীজারা	বাবাকে হত্যা
৬	সুধীর পরামানিক		দোয়ারীজারা	ভাইকে হত্যা
৭	রণজিৎ কীর্তুনীয়া		দত্তেরমেঠ	বাবাকে হত্যা
৮	সাবিত্রী মজুমদার	সন্তোষ মজুমদার	দোয়ারীজারা	স্বামীকে হত্যা

৯	কুমুদিনী মলোঙ্গী	রণজিৎ মলোঙ্গী	দোয়ারীজারা	স্বামীকে হত্যা
১০	রসিকলাল মণ্ডল	কার্তিক মণ্ডল	দামেরখণ্ড	গুলিবিদ্ধ হন
১১	শ্যাম রায়	সুবোধ রায়	দামেরখণ্ড	ঠাকুরদাকে হত্যা
১২	উত্তম মণ্ডল	শশীভূষণ মণ্ডল	দত্তেরমেঠ	ভাইকে হত্যা
১৩	স্বপন মণ্ডল	অজিত মণ্ডল	দত্তেরমেঠ	পিতাকে হত্যা
১৪	প্রকাশ মণ্ডল	শরৎ মণ্ডল	দামেরখণ্ড	ঠাকুরদাকে হত্যা
১৫	শংকর মণ্ডল	কালা রসিক মণ্ডল	দামেরখণ্ড	পিতাকে হত্যা
১৬	শেখর মল্লিক	অরুন মল্লিক	মাদুরপাল্টা	পিতাকে হত্যা
১৭	মনো কীর্তুনীয়া	রমনী কীর্তুনীয়া	দত্তেরমেঠ	পিতাকে হত্যা
১৮	অমর মহলদার	নগেন মহলদার	দিগরাজ	পিতাকে হত্যা
১৯	পলাশ মজুমদার	সন্তোষ মজুমদার	দামেরখণ্ড	পিতাকে হত্যা
২০	ধীরেন মণ্ডল	রসিক মণ্ডল	দামেরখণ্ড	পিতাকে হত্যা

(অসম্পূর্ণ)

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

ক্রমিক	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	বর্তমান অবস্থা
১	রীনা মণ্ডল	পিং: নিখিল মণ্ডল	নীতাখালী	ভারতে
২	রহিমা খাতুন	স্বা : ওহাব ফকির	ঢালীরখণ্ড	মৃত
৩	নমিতা মণ্ডল	পিং : শশীভূষণ মণ্ডল	দত্তেরমেঠ	মৃত
৪	শোভা মণ্ডল	পিং : আনন্দ মণ্ডল	মাদুরপাল্টা	ভারতে
৫	সাবিত্রী মজুমদার	স্বা: সন্তোষ মজুমদার	দামেরখণ্ড	ভারতে
৬	বিভা মণ্ডল	পিং : আনন্দ মণ্ডল	মাদুরপাল্টা	ভারতে
৭	শেফালী মণ্ডল	পিং : নরেন মণ্ডল	দামেরখণ্ড	
৮	কালো মণ্ডল	পিং : বাবু মণ্ডল	ধনখালী	মুসলিম পরিবারে
৯	অমলা মণ্ডল	স্বা : অনিল মণ্ডল	মাদুরপাল্টা	ভারতে
১০	সুভাষিনী মিস্ত্রি	পিং : মনোহর মিস্ত্রি	ধনখালী	
১১	কুসুম রায়	স্বা : মনিবর রায়	ধনখালী	
১২	সুষমা ঘরামী	পিং : যতীন ঘরামী	নিতাখালী	ভারতে

নির্যাতিতদের মৌখিক ভাষ্য

দামেরখণ্ড গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ও নির্যাতিতরা অনেকে জীবিত থাকলেও নির্যাতিত বীরাঙ্গনা সকলে গণমাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেননি। তাঁদের কয়েকজনে ভারতে এবং দেশে সংসার জীবন অতিবাহিত করছেন। একেবারে সব তথ্য ভাষ্যগুলোর মাধ্যমে উঠে না এলেও বহু বিচিত্র ঘটনা এবং আক্রমণসমূহের পরম্পরা, তার মাত্রা ও হিংস্রতার পরিমাপ উদ্ঘাটন করা যায়। এখানে কয়েকজনের ভাষ্য সংকলিত হল–

ঢাকার শাঁখারী বাজারে গণহত্যা
শিল্পী হাশেম খানের ড্রইং

তরু শীল
স্বামী : অজিত শীল, গ্রাম : দামেরখণ্ড, ডাক : সুন্দরবন, মোংলা, বাগেরহাট, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ : ঢালীরখণ্ড, ইস্রাফিল হোসেন ইজারাদারের বাড়ি, ১৯ অক্টোবর ২০১৩

একাত্তরে যেদিন আমাদের এলাকায় রাজাকাররা আক্রমণ করে সেদিন আমরা বাড়ি ছিলাম। যখন তারা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে, আমরা দৌড়ে চলে গেলাম বিলের মধ্যে। আমার সাথে ছিল এক জা, আমার শাশুড়ি ও আমার এক দেবর। ভয়ে আমাদের হুঁশ ছিল না। একটা বাগানের কাছে এমনভাবে পালালাম যে, রাজাকাররা সহজে দেখে ফেলে। ওরা আমাদের পিছে পিছে গিয়ে প্রথমে আমারে ধরে খুব পিটায়। সে সময় আমার পেটে বাচ্চা। আমি চিৎকার করে কাঁদতে থাকি আর আমার শাশুড়ি ওদের কাছে কাকুতি মিনতি করে। পরে আমারে ধরে নিয়ে যাবে বললো। আমার শাশুড়ি বললো যে, না আমার মাকে দেব না। এই বলে আমার হাত টেনে ধরে। তখন শাশুড়িকে ওরা ভীষণ মারধর করে। মারের চোটে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারপর রাজাকাররা আমাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। ১০-১২ জন

তরু শীল